# রূপকথার গল্প

আলম তালুকদার

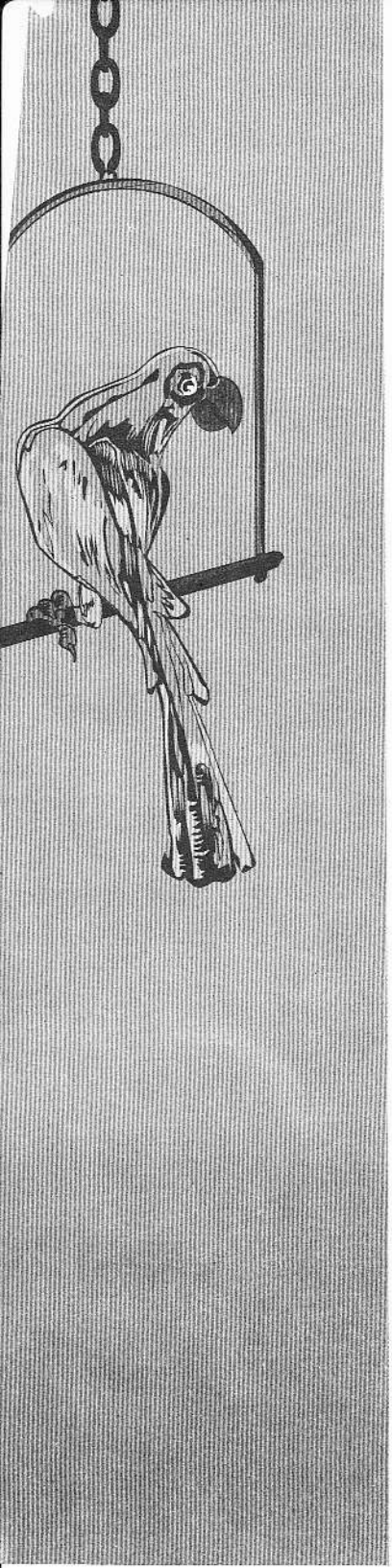

# রূপকথার গল্প

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বর্ধমান: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SC-JAI

banglabooks.in

বিজয় প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০০৫

প্রকাশক
তপন মাহমুদ
বিজয় প্রকাশ
১২, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

কম্পিউটার কম্পোজ
ম্যাক্সেল কম্পিউটারস
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
সালমানী প্রিন্টার্স
৩০/৫ নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-8446-26-5

মূল্য : ৭০.০০

**উৎসর্গ**

কারো নিয়তি যায় না জানা
আমার সন্তানের আপন নানা
রূপকথার মতো অবারিত
সর্বদাই আশায় তাড়িত
যাঁর বিশ্বাস আল্লাহর মহিমা অপার
তিনি আলতাফ হোসেন মাস্টার
তাঁর জন্য উৎসর্গ সমাহার

banglabooks.in

# সূচিপত্র


এক দুই তিন ৯
একজনের জন্য দশজন বাঁচে ১৩
ই-দের ঈদের দিনে ১৬
এক বামন দেবতাকে খেয়েছিল ২১
দুই বয়াম ফার্সিভাষা ২৬
সংগীতপ্রিয় দৈত্য ২৯
গন্ধর্বসেন মারা গেছেন ৩৫
বলবে, র'য়ে স'য়ে বলবে ৩৯
একটি সাদামাটা গল্প ৪২
পিপীলিকার পাখা গজায় মারিবার তরে ৪৮
একাত্তরে একজন দাদির গল্প ৫১

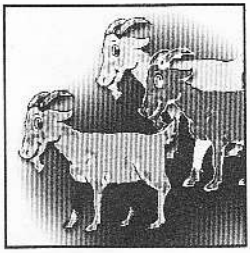

## এক দুই তিন

এক দেশে ছিল এক বেজায় ধনী এবং ক্ষমতাবান রাজা। যখন-তখন যাকে ইচ্ছা তাকে দেয় সাজা। তিনি এমন রাজা। যা বলেন তাই হয়। যা চান তাই পান। যা বুঝেন তাই ঠিক। তার কথার কেউ ধরে না লিক। আরশোলা টিকটিকি তারাও বলে ঠিকঠিক। আরো বেশি মহাঠিক। এমন অবস্থায় বেকায়দা ফায়দা হাসিলের রাজা আর কী।

তো, ঐ রাজার একদিন মনে হল : আমি যা জানি বা যা বুঝি তা অন্যরা বুঝে কিনা এটা যাচাই করা দরকার। যেমন ভাবা তেমন কাজ। একদিন তার উজির নাজির চাকর বাকর সেপাই সবাইকে ডেকে বললেন, তারা কি আঁচ করতে পারে, রাজা কী ভাবছেন? তা তারা বলবে কীভাবে? তারা তো আর রাজার মতো শিক্ষিত নয় : রাজা যা বুঝে বা জানে তা যদি তার অধীনস্থরা জানে বা বুঝে তাহলে তো সবাই রাজা হয়ে যাবে। কাজেই তারা বলল : আপনি যা জানেন বা বুঝেন তা তারা কেন বাপ-দাদার চৌদ্দ গোষ্ঠীর জেতা বা মরা কেউ বলতে পারবে না। তার অমাত্যবর্গ কেউ যখন রাজার মনের কথা বলতে পারল না তখন তিনি খুব হতাশ হয়ে কষ্ট পেয়ে একটু রাগ নষ্ট করে দিলেন।

তখন তিনি করলেন কী! যখন বুঝলেন তখন তিনি তার বুদ্ধিমান অগামার্কা প্রধান উজিরকে বললেন : আমার দেশে কি এমন কোনো বুদ্ধিমান প্রজা নেই যে আমার মনের কথা আঁচ করতে পারে! রাজা তাকে মাত্র সাত দিনের সময় দিলেন। এই সাতদিনের মধ্যে যদি এমন লোক না আনতে পারে তবে তার উজিরগিরি শেষ করে দিয়ে তার বেতন বন্ধ করে দেয়া হবে।

তো, উজিরের হয়ে গেল আর কী! মানে বায়ু পাতলা হয়ে আটকে গেল, বুঝলে। উজির তো পিঁপড়া মারতে মারতে বাড়িতে গেল। তার

আদরের কন্যা বাবার উড়াধুড়া চেহারা ছুরুত দেখে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবকথা শুনে উজিরকন্যা বলল : তুমি কোনো চিন্তা কোরো না; আমি তোমাকে যথাসময়ে লোক দিব। সে রাজার মনের কথা ঠিক ঠিক বলে দিবে। তুমি চিন্তা ত্যাগ করো।

উজির মেয়ের কথায় ভরসা পেয়ে খুশি হয়ে দুইথাল ভাত বেশি খেয়ে আরামে ঘুম দিলেন।

সাতদিন পরের ঘটনা। উজিরের মেয়ে হাজির হল। সাথে এক বোকাসোকা কোকা খোকা পোলাকে নিয়ে।

উজির ঐ বোকা কোকাকে দেখে নিজেই বোকা হয়ে গেল। মেয়ের উপর ভরসা করা ঠিক হয়নি বলে তার আফসোস। কিন্তু মেয়ে বলে : আমাদের এই বোকা রাখালই দেখবে রাজাকে বোকা বানিয়ে সোজা করে দিবে।

কী আর করা, সময় তো বয়ে যাচ্ছে। বোকাই সই। তাকে নিয়ে উজির রাজদরবারে হাজির হল।

রাজার দরবারে সবাই হাজির। উজির কাঁচুমাচু হয়ে বোকাটাকে নিয়ে রাজার সামনে হাজির করলেন। তাকে রাজা দেখে তেমন কোনো বিশেষ ভাব প্রকাশ করলেন না। তবে তার দিকে তাকিয়ে রাজা একটা আঙুল তুললেন মাত্র। এক আঙুল দেখে বোকা রাখাল দেখাল দুইটা আঙুল।

রাজা তখন দেখালেন তিনটা আঙুল।

তখন রাখাল জোরে জোরে মাথা নাড়ছে আর পালানোর পথ তালাশ করছে।

রাখালের করুণ অবস্থা দেখে রাজা হেসে হেসে অস্থির। রাজা খুব খুশি। তিনি উজিরকে ধন্যবাদ দিলেন। কী মজার বুদ্ধিমান লোককেই না আনা হয়েছে। উজির মোটা দাগের বকশিশও পেলেন।

উজির তো ভিতরে ভিতরে ভাবিত। কী থেকে কী হল তিনি কিছুই বুঝতে না পেরে রাজাকে বিষয়টা খোলাসা করার জন্য অনুরোধ করলেন।

তখন রাজা বলতে থাকেন : আরে আমি তাকে একটা আঙুল দেখিয়ে বুঝিয়েছি আমি কি একাই রাজা নাকি আরো কেউ আছে? তো ঐ লোকটা দুই আঙুল তুলে বুঝাল, না আরেকজন আছেন তিনি ভগবান। আমার যত

ক্ষমতা তাঁরও সেরকম ক্ষমতা আছে। আমি তখন তাকে তিনটা আঙুল দেখিয়ে বললাম আরো কেউ আছে? সে প্রবল আপত্তি জানিয়ে 'না' করল। আমার মনের কথা সে ধরে ফেলেছে, বুঝলে? এতদিন ভাবতাম আমি একাই ক্ষমতাবান কিন্তু আরো একজন যে আছে তা সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তবে তৃতীয় বলে কেউ নেই সে সেটাও বলেছে।

তারপর দরবার শেষ। যে যার ঘরে চলে গেল।

রাতে উজির তার রাখালকে ডেকে প্রশ্ন করে : রাজার সাথে তার কী মনের কথা হল?

জবাবে রাখাল বলে : হুজুর, আমার তো মোটে তিনটা ছাগল। আপনি আমাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলে রাজা আমাকে একটা আঙুল দেখালেন। আমি বুঝলাম তিনি একটা ছাগল আমার কাছে চাচ্ছেন। তা তিনি এতবড় রাজা তাকে একটা না দিয়ে বললাম : একটা না, আমি আপনাকে দুটো ছাগল দিব। কিন্তু তিনি তিনটা আঙুল তুলে যখন তিনটা ছাগলই নিতে চাচ্ছেন আমি তখন ভাবলাম এটা রাজার বাড়াবাড়ি। তাই শরম পেয়ে পালাবার পথ খুঁজছিলাম–এই আর কী!

*(সাঁওতালি রূপকথা)*

## একজনের জন্য দশজন বাঁচে

কোনো এক গ্রামে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ বাস করে না। যে কয়েক ঘর আছে সবই বামন। তারা সবই ভারি ধার্মিক। তারা শাদাসিধা জীবন যাপন করে থাকে। সকাল বিকাল পুজো-অর্চনা করে দিন কাটায়। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মতোই তাদের বাড়িতে সবসময়ে জ্বলে অনির্বাণ আগুন। তারা কখনো সে আগুন নিভতে দেয় না।

একদিন হল কী। এক পরিবারের ছোটবউয়ের গভীর রাতে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। পরিবারের সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কী করে, এদিকে সে আর পারছে না। শেষপর্যন্ত ঘরের মধ্যে পবিত্র আগুনের কয়লার ওপরেই কাজটি করে আরামে শুয়ে পড়েছে। সকালে ঘুম থেকে সবাই অবাক, কাঠ কয়লার মাঝে একখণ্ড সোনা!

সবাই অবাক। বাড়ির কর্তা বলে, কেউ হয়তো অধর্ম করেছে। তা না হলে বামন বাড়ির অগ্নিকুণ্ডে সোনা আসে কীভাবে? বাড়ির সবাইকে জেরা করা হল। শেষে জানা গেল ছোটবউ অপকর্মটি করেছে। তাকে এবং পরিবারের সবাইকে সাবধান করে দেয়া হল। এ কাজ করলে সমূহ বিপদ। ছোটবউ বাইরে গেলে একজন সাথে থাকবে।

কিন্তু এখবর আর ছাইচাপা থাকল না। এক কান দু'কান করে করে ঘরে ঘরে খবর চলে গেল। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর অতি দ্রুত সব বাড়িতে সোনা ফলতে থাকল। অনেকে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল। বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ হতে থাকল। জামা-কাপড়ে পরিবর্তন হতে থাকল। গরিবরা সবাই বিরাট ধনী হয়ে গেল। শুধু এক বামন বাদে।

তার পরিবারে নিত্য ঝগড়া। গ্রাম তখন শহর। আর তাদেরটা বস্তি। তার বউ বামনের সাথে নিত্য বিবাদ করে। তার গিন্নি বলে, পবিত্র আগুনের কাছে আমাকে একবার যেতে দাও না গো। গেলেই তো

আমাদের অবস্থা ভালো হয়ে যায়। গরিবি হাল শেষ হয়। আর কত দিন আমরা গরিব হয়ে কষ্ট করব? একটিবার যেতে দাও, একখণ্ড সোনা হলেই হবে। তাতে আমাদের অনেক দিন চলে যাবে।

বামন-গিন্নির চাপে বামনের নট নড়নচড়ন। সে তার বউকে কিছুতেই এ অধর্ম করতে দিবে না। কিন্তু একদিন তার বউ খুব জ্বালাতে লাগল। তার ঠেলায় আর বামন টিকতে পারে না। তখন সে তার বউকে বলে : জানো এখনো এই গ্রামটা কেন একতাবদ্ধ আছে?

—কারণ তুমি আমাকে ঐ কাজটি করতে দাও না, সেইজন্য। সবাই ধনী হোক আর তুমি চাও আমরাই গরিব থাকি। এটাই কি সেই কারণ?

বামন বলল : যদি বলি তাই।

শুনে গিন্নি তো আরো খেপে গেল। হ্যাঁ দেখা আছে–কী আমার বামন, তার আবার কত নীতিকথা?

বামন সব সহ্য করে বলল : ঠিক আছে তবে তাই হোক। চলো আমরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। চলে গেলেই বুঝবে আমি কেমন বামন।

শেষে তাই হল । ওরা গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করল।

কয়েকদিন পর নিজের গ্রাম হতে খবর আসা শুরু হল। প্রথমে ভাইয়ে ভাইয়ে, তারপর প্রতিবেশী প্রতিবেশী রেষারেষি, শেষে মামলা-মোকদ্দমা মারামারি। বিনাশ্রমে অধর্মের টাকা হলে যা হয়। একমাসের মধ্যে দেখা গেল নিজেরা মারামারি ঝগড়াঝাঁটি করে করে ফতুর হয়ে গেল। অর্ধেক সোনা আর এল না। সব দেখেশুনে বামন তার গিন্নিকে বল : কি, বলছিলাম না একজনের জন্য দশজন বেঁচে থাকে। এখন বিশ্বাস হল?

তার গিন্নি শরমে প্রায় যায়-যায় অবস্থা আর কী।

## ই-দের ঈদের দিনে

ই-দের মানে পিচ্চিদের। পিচ্চি মানে যারা পিচকারি বা চিৎকার দেয়, কারণে অকারণে, তাদের ঈদের দিনে ঘটিতব্য ঘটনা বর্ণনার ঘনঘটা।

গালা গ্রামের তালুকদার বাড়িতে, মানে আমাদের বাপ-দাদার বাড়িতে ঈদ উপলক্ষে হাট বসেছে। বাবাতো, কাকাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইবোন মিলে তা দু'ডজন তো হবেই। আমার দাদি সবার নামের তালিকা তার শোয়ার ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছে। শুধু ঝুলিয়ে রাখেনি, মাঝে মাঝে বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুলিয়ে ফেলে। এক কিলো বিরক্তিকর শ্বাস ফেলে ভারমুক্ত হয়ে সবার নাম ভুলে যান। হৈ-হল্লা কৈ-বল্লা? কে যে কোথায় চল্লা যায় তা সহজে যায় না বল্লা।

এমন নাতিপুতি মিশ্রিত বিতিকিচ্ছিরি বেতাল পরিবেশ পরিস্থিতিতে সবার মাথার নাট-বল্টু বেসামাল।

তো, আমি সব পিচ্চিদের একটা নোটিশ দিলাম এবং স্বঘোষিত নেতা বনে গেলাম। আমি তাদের উদ্দেশে ঈদের দিনে আমাদের কী করণীয়, কী ধরনীয়, কাকে কাকে বরণীয় এবং আজকের দিনে কারা কারা স্মরণীয় সে-সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ, সরি ভাইবোনদীর্ঘ একটা যুৎসই বক্তব্য পেশ করলাম।

আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, বুড়োদের সামনে হৈচৈ করা যাবে, গোলমাল করা যাবে না। কথা বলা যাবে, তর্ক করা যাবে না। দাবিদাওয়া পেশ করা যাবে তাদের মনের ভাবগতিক দেখে। দাবি আদায় না হলে ধর্মঘট করা যাবে না। তবে অনশন করা যাবে। আর ঈদের নামাজ শেষে গ্রামের সব বাড়িতে মিষ্টি খেতে যাওয়া হবে। ধনী গরিব নির্বিশেষে। দুপুর দু'টায় সবাইকে আবার একত্রিত হতে হবে। এইসব শিশুতোষ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের সভার কার্যক্রম শেষ হল। তবে শেষ করার আগে আমি বললাম : ঈদের দিন বিকালে আমি একটা বিশেষ 'শো' পরিবেশন করব। সেটা কী? অতীব গোপনীয়।

ঈদের দিন। আমি, যামি, তামি, সামি, গামি, হামি, পাসি, হাসি, টসি, নসি, দড়ি, রসি, তনি, বনি, রনি, মনি, সনি মোট ২৫ জনের ব্যাটালিয়ান ঈদের জামাতে হাজির হলাম। তালুকদার-বাড়ির বাহিনী নিয়ে অনেকে অনেক কাহিনী বানিয়ে আমাদের কানে ঢেলে দেবার অপচেষ্টা করল। কিন্তু আমরা শুনেও না-শুনে নামাজ শেষ করে আমাদের অভিযান শুরু করে দিলাম। ২৫ জনকে মিষ্টি খাওয়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। অনেকের বাড়িতে চামচ প্লেট নেই। যাক, আমরা নিজ হাতেই এক চিমটি করে খেয়ে খেয়ে বিভিন্ন বাড়িতে ধেয়ে ধেয়ে যেতে থাকি। আমাদের ভাব দেখে অনেকে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গিয়ে প্রাণ এবং মান রক্ষা করেছিল। এটা অবশ্যই একটা রেকর্ড। ঈদের দিনে দাওয়াত দিতে হয় না, দাওয়াত নিতে হয়।

যাক হৈ চৈ করে দুপুর গড়িয়ে বিকাল আসন্ন। আমাকে তো বিষণ্ন থাকলে চলবে না। আমি আমার প্রস্তুতি নিতে থাকি।

দাদির আদরের একটা বিড়াল ছিল। আদর করে ডাকলে আর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই ন্যাকা ন্যাকা হয়ে 'আরো আদর আরো আদর চাই' ভাব করে। আমি ওর নাম দিয়েছি দিদানি। দিদানিকে আমি কোলে নিয়ে সবাইকে ডাকলাম। আমাকে ঘিরে সবাই দাঁড়াল। আমি দর্শকদের বললাম: শোনো, আমাদের দিদানি ইংরাজি বলতে পারে এবং বুঝতে পারে।

সবাই হা হা করে হে হে করে খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে।

আমি অবিচলিতভাবে ওদের হাসিকে দলিত কলিত করে আমার ঘোষণা ফলিত করতে মরিয়া হয়ে বিড়ালকে আদর দিয়ে বলে উঠি : এই দিদানি বল্‌তো, 'এখন' ইংরাজি কী? বলে একটু আদর দিলাম।

ও আদর পেয়ে বলে, 'নাউ'।

আমি গর্বিতভাবে গর্ব চিবিনো ভাব দেখাই। বলে কী?

ওরা তো অবাক। আমি বলি! আরো আছে।

এই দিদানি বল্ তো চীনের মাও চেয়ারম্যানের নাম কী?

: মাও।

ওরা চমকে ওঠে।

: হে হে সাধারণ জ্ঞান বুঝলে? ও সাধারণ জ্ঞানেও পারদর্শী এবং দূরদর্শী।

দর্শকেরা আনন্দ না বিস্ময়ে হাততালি দিতে...

আমি বিড়ালকে ছেড়ে দিয়ে এবার দাদির আগামী কোরবানি ঈদের কোরবানিযোগ্য রামখাশিতে মেতে উঠি। ওর নাম ডিসু। ডিসুমডুসুম গুঁতা মারে তো, তাই ওর নাম ডিসু। ওকে একটু কলার চোচা নেড়ে আদর দিলেই তেড়ে আসে। ডিসু কাছে আসলেই দুই হাতে আদর দিলাম। আদর দিচ্ছি আর বলছি : শোনো, আমাদের ডিসু না কথা বলতে পারে! তাও আবার ইংরাজি কথা।

শুনে সবার চোখ ভরা মাথা। বলে কী? ছাগলে কথা বলবে? তাও আবার ইংরাজি ? ছাগলের সাথে থেকে থেকে কি ছাগল হয়ে গেছে? আমাদের নেতা প্রিয়ং তাং! পা লম্বা মাথা গোল হলে নাকি পাগোল হয়। তো, দর্শকদের মাথা একেবারে যাকে বলে আওলা ঝাওলা হয়ে বালু বালু হয়ে তালু শুকিয়ে গিয়ে ভেদবুদ্ধি সব লুকিয়ে কূল পায় না আর কী। আমি ওদের চরচরা খরখরা চোখ-মুখ দেখে আনন্দে পুলকিত হয়ে আলোচিত হতে থাকি।

—কী, বি-বিশ্বাস হচ্ছে না এইতো? আরে তোরা তো বিশ্বাস করবিই এমনকি ঘোড়া আছে না, যে ঘোড়া এখানে উপস্থিত নেই সে ঘোড়াও আমার কথায় বিশ্বাস এনে নির্বাচনে আমাকে ছাগল মার্কায় ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে তাদের পক্ষে কিছু বলার জন্যে ঐ যে কী বলে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে দশ দিন না-খেয়ে আমাকে খাওয়াবে বুঝলে?

আমার কথায় ওরা আরো বিভ্রান্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দুর্দান্ত হয়ে শান্ত হতে ইতস্তত করতে থাকে। আমি আমার কথায় অটল হয়ে কলকলিয়ে ডিসুকে কাছে ডেকে অজগজ মজারু চিরুনি আদর দিয়ে তাকে আমার পক্ষে আনার কসরৎ চালাতে থাকি। তারপর ওদের বিস্ময় কাটতে-না-কাটতে আমি আমার নরম হাত ডিসুর গায়ে চালিয়ে চালিয়ে বলতে থাকি : এই ডিসু বল তো, ইংরাজি এপ্রিল আর জুন মাসের মাঝখানের মাসের নামটা কী? বলেই ডান হাত দিয়ে ডিসুর মাজায় একটা করুণ চাপ দেই। চাপ খেয়ে ও হঠাৎ বলে ওঠে : ম্যা। আমি আরো দ্বিগুণ শব্দে কয়ে যাই : ঐযে মে মানে মে মাসের নাম বলেছে। ওরা সবাই বে-বাক। আরে তাইতো মে মানে ম্যা, মানে মে মাসের নামটাই তো! কী আশ্চর্য! ওরা অবাক হয়ে ছাগল-ছাগল ভাব নিয়ে পাগল-পাগল স্বভাব প্রকাশ করতে থাকে। একসময় তালির প্রকোপে সবাই তালির তলে তলিয়ে যায় আর মনে মনে ভিরমি খায়। আমাদের ডিসুর আদর আর আপ্যায়ন বেড়ে গিয়ে জামাইর আদর ছেড়ে গেল আর কী, এমন দুরবস্থা। ই-দের ঈদের আনন্দ আমাদের গ্রাম ছেড়ে আকাশে বাতাসে এমনকি পাতালেও ছড়িয়ে গেল।

এদিকে আমাদের আনন্দের আড়ালে আমাদের পাশের বাড়ির মটু, যে নাকি আমাদের বয়সের, সে আরেক কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে আমার সমস্ত ম্যাজিক অর্জন বর্জনের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে হেস্তনোস্ত করে ফুট্টুস আর কুট্টুস করে দিল।

আমার পর্ব শেষ হবার পর সে চিঁ চিঁ করে ঘোষণা দেয় যে তাদের একটা তোতাপাখি আছে, যে পাখির চমৎকার উপস্থিত-বুদ্ধি। ঘোষণামাত্র আমাদের মামাতো বাবাতো কাকাতো ফুফাতো ভাইবোনেরা তা পরখ করার জন্য মহাব্যস্ত হয়ে খিস্তিখেউড় শুরু করে দিল। আমি বললাম : এই মটু, কটু বলার আগেই চটাচট তোর তোতা নাকি কোতাপাখি এখানে নিয়ে আয় দেখি তার কেমন ধারালো সুবুদ্ধি না কুবুদ্ধি।

চিলের আগেই যাবার জন্য মটু চিল-মার্কা দৌড় দিয়ে গেল আর এল। হাতে তোতাপাখির খাঁচা। আমার ধারণা ছিল তোতা নেই । কাছে আসলে দেখি বেশ নাদুসনুদুস তোতাপাখি। মটু কাছা দিয়ে খাঁচাটাকে গাছের একটা ডালে চমৎকার ঝুলিয়ে দেয়।

তোতাটা আমাদের অনেক কালো মাথা আর টলটলা চোখ দেখে একটুও না চমকে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠে, "এই যে বাইয়া, তুমি খুব দুষ্ট।" আমি বাক্যটা শুনে খুব মর্মাহত হয়ে মটুকে ক্ষত করার চেষ্টা চালাবার মতলব আঁটতে থাকি। কিন্তু আমি তোতার সামনে খুব মায়াবী ভাব নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই। এবারেও সে আমাকে ঐভাবে বলল, "এই বাইয়া, তুমি খুব দুষ্ট।" এবার নো খাতির। পাখির খাঁচায় মারলাম এক থাপ্পড়। আর মটুর কানেও একটার সামান্য রাগ বিতরণ করে দিলাম। তখন মটু আমাকে অভয় দিয়ে বলতে থাকে : আর এমন হবে না। ও তোতাপাখির কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলে এল। আমাদের তাং বাহিনীর নট নড়নচড়ন। ওদের মুখে কোনো কথা নেই। কারণ ওদের নেতার এখন খেতাই থাকে না। তোতাটা আমাকে যেভাবে ভোঁতা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাতে সবার মানসম্মানের হানি হয়ে একটা ফানি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তা চুপচাপ উপভোগ করে শোক করবে না কোক খাবে এখন সে ভাবনাতে ওরা মশগুল থেকে দশভুল করতে ত্যক্তভাবে বিরক্ত।

তো এরপর যা হল তা আর কহতব্য না। থাক্ আর না বলি। বললে আমার মানসম্মানের ঘাটতি হবে। আমার আর তেমন কাটতি থাকবে না। কী বললে? ও, তোমরা কাউকে বলবে না! সত্যি? এ্যাঁ, তিন সত্যি? আচ্ছা তাহলে বলি।

আমি আবার তোতার কাছে যেতেই বলল : এই বাইয়া। বলেই চুপ। আমি বলি :

কী? তোতাপাখি বলে ওঠে : বুঝতেই তো পারছেন!

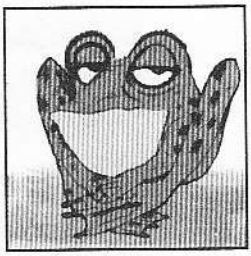

## এক বামন দেবতাকে খেয়েছিল

বিধাতা জন্মকালে সকলের কপালের লিখন লিখে তারপর দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। বাংলার এক বামনের ভাগ্যে বিধাতা যা লিখে পাঠালেন, তাতে বেচারা গরিব বামনের তো জীবনের বারো ছেড়ে তেরোটায় গিয়ে ঠেকে আর কী। সে কখনও পেট পুরে আশ মিটিয়ে খেতে পারে না। খাওয়া অর্ধেক হলেই একটা-না-একটা অঘটন ঘটে, ফলে তার আর পেট ভরে খাওয়া হয় না। তার জন্য বামনের আফসোসের অন্ত নেই।

তো একবার হল কী। রাজবাড়ি হতে বামন নিমন্ত্রণ পেয়েছে! তাতেই সে খুশিতে আটখানা হতে হতে ষোলোখানা হয়ে যায় এমন খুশিত অবস্থা।

খুশির চোটে বউকে বলে : রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ পেটপুরে খাওয়া হবে। জীবনের আশা পূর্ণ হবে। আহারে, শোনো আমার ছেঁড়াফাড়া যেসব কাপড়-চোপড় আছে ওগুলো ভালো করে সাফ ছুতরো করে দাও দিকিনি। ভালো পোশাকে না গেলে আবার দারোয়ান বেটা ঢুকতে দিবে না, বুঝলে?

তার গিন্নি ছেঁড়া জামা মেরামত আর পরিষ্কার করে দিল। তারপর ঠিক দিনে ঠিক সময়ে রাজবাড়ি গিয়ে হাজির হল।

রাজবাড়িতে ভোজ চলছে। সে বসে গেল। বসে পড়া মাত্র নানা ধরনের খানাখাদ্য পরিবেশন করা হল। যেই না তার আধা-খাওয়া হয়েছে অমনি ছাদে ঝুলানো একটা মাটির ভাঁড় তার পাতে হুমড়ি খেয়ে আছাড় খেল। আর বামনের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। জল খেয়ে উঠে রাজার কাছে বিদায় নিতে হাজির হল। রাজা তাকে বলল : কী ঠাকুর, খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে তো?

—রাজা ঠাকুর, আপনার লোকেরা খুব ভালো করে পরিবেশন করেছে। তবে আমার খাওয়া ভরপেটে হয়নি। তাদের কোনো দোষ নেই। আমার কপালে লেখা নেই।

—কেন, কী হল?

—মহারাজ , যখন খাচ্ছি তখন, ঠিক তখনি উপর হতে মাটির ভাঁড় আমার পাতে পড়ল। আর আমার খাওয়া হল না।

রাজা এসব শুনে খেপে গেল। তার লোকজনকে গালাগালি দিল। তারপর রাজা বামনকে রাতটা থেকে যেতে বলল।

—কাল আপনার জন্য রান্না হবে, আমি আপনাকে নিজ হাতে খাওয়াব।

পরদিনের ঘটনা। রাজা নিজ হাতে তাকে খাওয়াচ্ছেন। নিজে কয়েক পদ রান্নাও করেছেন। আর যে ঘরটাতে বসানো হয়েছে সে ঘরে বাগড়া দেবার মতো কিছু রাখা হয়নি। ব্যবস্থা দেখে বামন তো খুশিতে বাকবাকুম বাকবাকুম। খাওয়া আধাআধি যেই হয়েছে, বিধাতা ভাবলেন এবার তো বাগড়াটা দিতেই হয়। কিন্তু ঘরের যে অবস্থা তাতে বাগড়া দেবার কোনো সুযোগ না পেয়ে বিধাতা নিজেই সোনাব্যাঙ হয়ে কলাপাতায় লাফিয়ে পড়েছেন। বামনের কোনোদিকে খেয়াল নেই। তার ইচ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে। কাজেই সে কোনোকিছু নজর না করে ভাতের দলার সাথে ব্যাঙটাও খেয়ে ফেলেছে।

খাওয়া শেষে রাজা বললেন : কী বামন ঠাকুর, কেমন হল।

সে বলল জীবনে এত তৃপ্ত হয়ে পেট ভরে আর কখনও খানা খায়নি। রাজা তাকে কিছু টাকা আর উপহার দিয়ে বিদায় দিল। সে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

সন্ধ্যার সময় সে এক বনের ধার দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শোনে, "অ-বামন আমারে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।" কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু আবার কানে এল, "অ-বামন আমারে ছেড়ে দে।"

—কে তুমি?

—আরে আমি বিধাতা, আমি বিধাতা।

—তা তুমি কোথায়?

—তোর পেটে।

—বেসম্ভব কথা।

—নারে অসম্ভবের কথা। আমি এখন তোর পেটে। আমি ব্যাঙ হয়ে লাফিয়ে তোর পাতে পড়লাম আর তুই কিনা আমায় খেয়ে ফেললি!

—আমার কাছে এর চাইতে আর সুখবর আর কী হতে পারেরে শয়তান! সারাটি জীবন আমারে জ্বালিয়ে মেরেছিস। তোকে বের তো করবই না বরং টুঁটি চেপে ধরে রাখব।

—বাবা বামন আমারে ছেড়ে দে। আমার দম যে চলে না।

বামন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে তার বউকে বলে, বউ তাড়াতাড়ি এক ছিলিম কড়া তামুক হুঁকোতে সাজিয়ে দাও তো।

বামন মনের সুখে তামাক টানছে। ওদিকে বিধাতার দম ধোঁয়ায় আরো বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। বিধাতার কাকুতি মিনতি সে আমলেই নিচ্ছে না।

ওদিকে স্বর্গে-মর্তে গোলযোগ দেখা দিল। বিধাতা নেই। ত্রিভুবন বুঝি লোপ পায়! দেবতারা পরামর্শে বসল। ঠিক করলেন, লক্ষ্মী ঠাকুরুনকে পাঠানোটাই ঠিক হবে। লক্ষ্মী তো শুনেই বলল, বামনের কাছে গেলে আমি আর জ্যান্ত আসতে পারব না। কিন্তু দেবতাদের কাকুতি মিনতিতে তাকে যেতেই হল।

খুব বিনয়ের সাথে গলবস্ত্র হয়ে সম্মান দেখিয়ে লক্ষ্মী হাজির হল। বামন তাকে বসতে বলে বলল, তা গরিবের বাড়িতে অসময়ে কেন আসা ?

—তুমি বিধাতাকে কয়েদ করেছ। তাকে ছেড়ে দাও নইলে ত্রিভুবন রসাতলে যাবে যে।

—ও বামনি, দাও তো লাঠিখানা। এই লক্ষ্মীকে কত ছেদ্দা করি, তিনি জীবনে আমার একবারও খোঁজ নেননি। আজ আমার দোরে। তাকে একটু আদর করি, দাও লাঠিটা দাও জলদি।

শুনেই লক্ষ্মী হাওয়া।

দেবতারা পরামর্শ করে সরস্বতীকে পাঠালেন। বামন তাকেও লাঠি দেখিয়ে বিদায় করল।—বিদ্যার ব দাওনি, আবার এসেছ ওকালতি করতে?

সে ভয়ে প্রাণ নিয়ে ভোঁ দৌড়।

শেষে স্বয়ং মহাদেব দায়িত্ব নিয়ে সে বামনের বাড়িতে হাজির হলেন। বামন হল শৈব। তাকে দেখেই স্বামী-স্ত্রী পা ধুতে জল দিল, ফুল দুর্বা দিয়ে নৈবেদ্য দিল। শিব বসলেন।

—বিধাতাকে ছেড়ে দাও।

—আপনি যখন এসে গেছেন ছেড়ে তো দিবই। কিন্তু বিধাতার কারণে যে জন্ম থেকে জ্বলছি তার কী হবে? সে-ই নাটের গুরু।

—কোনো চিন্তা করো না। আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি।

বামন হা করল। বিধাতা বের হল। শিব তার বউসহ বামনকে সশরীরে কৈলাসে নিয়ে গেলেন।

*(বাংলার রূপকথা)*

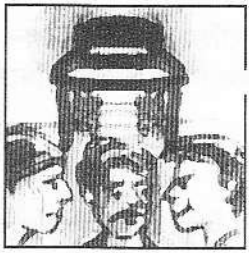

## দুই বয়াম ফার্সিভাষা

অনেক মানে বহু বহু দিন আগের কথা। একবার হল কী, দুরানীরা পাঞ্জাব এলাকা দখল করে নিল। ঐ এলাকার মধ্যে ছিল একটা তাঁতিদের গ্রাম। তাঁতিদের ভাষা পাঞ্জাবি আর দুরানীদের ভাষা ফার্সি। এখন? তাঁতিরা খুব ঝামেলায়। ফার্সির ফ বুঝলে তো। সরকারি লোকজন এসে তাদের কী বলে কী নিয়ে যায় এক বিতিকিচ্ছা অবস্থা। বিশেষত তহশিলদার যখন খাজনা নিতে আসে তখন ওদের ঠকিয়ে যায়। ওরা হিসাব বুঝতেই পারে না। তখন গ্রামের সব তাঁতি বসে ঠিক করল ওদের কিছু ফার্সিভাষা দরকার। তাঁতিরা সবাই চাঁদা তুলে গ্রামের দুজন জ্ঞানীকে ঐ দেশে পাঠিয়ে কয়েক বয়াম ফার্সিভাষা আনার সিদ্ধান্ত নিল।

যেমন কথা তেমন কাজ। পড়ে গেল সাজ-সাজ। তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে গুণে জীবন্ত কিংবদন্তি এমন দুজনকে টাকাপয়সা দিয়ে কাবুলে বা তাবুলে পাঠানো হল। খুব দামিটাই আনতে হবে, তাই তারা পেশোয়ার, খাইবার পাসের দুর্গম এলাকা পেরিয়ে গেল। গ্রামের দিকে যার সাথে দেখা তাকেই ওরা বলে, তা আছে নাকি বেচার মতো কিছু ফার্সি ? সবাই হাসে অথবা পাগল বলে উপহাস করে। কেউ আবার 'যা ভাগ' বলে তাড়িয়ে দেয়।

তো, ওরা হাঁটতে হাঁটতে কাবুল শহরে গিয়ে হাজির হল। শহরে ঢুকতেই দেখা হল একজনের সাথে। তাকে দেখেই বলে, ভাই আছে নাকি?

—কী?

—আমাদের গ্রামের জন্য কিছু ফার্সি ভাষা কিনতে চাই।

—তাই! আছে মিলবে।

লোকটা টাউট আর বাটপাড়। সে খুব খুশি, কিছু কামাই হবে।

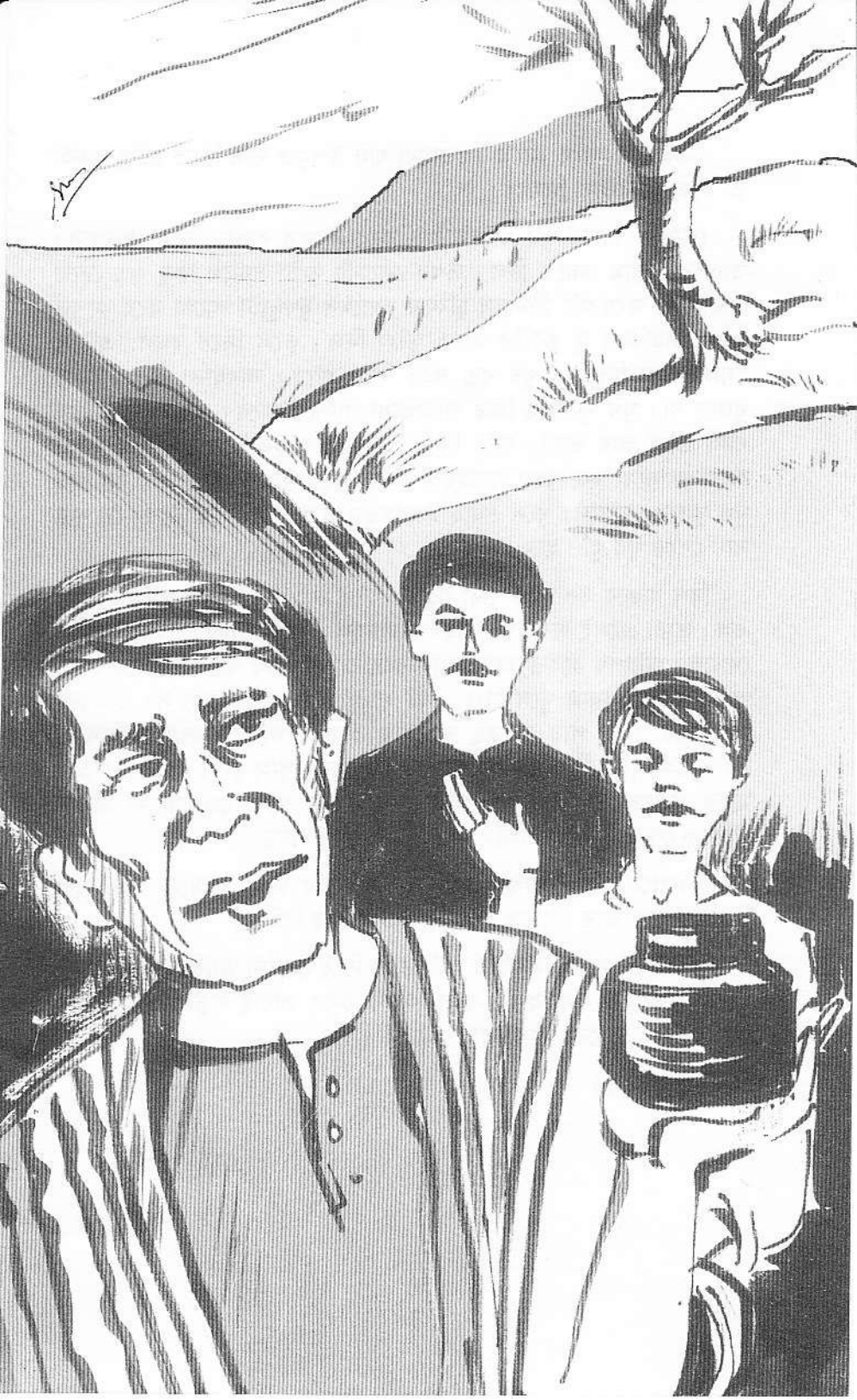

—আমার সাথে আসো। তোমরা যদি উপযুক্ত দাম দিতে রাজি থাকো তা হলে ফার্সিভাষা মিলবে।

লোকটি ওদের খুব খাতির যত্ন করে নিজের বাসায় নিয়ে খাওয়াল। তারপর বিশ্রাম করতে দিল। তখন লোকটা দুটো বয়ামে কিছু গুড় ঢেলে তার মধ্যে কয়েকটা ভীমরুল ঢুকিয়ে বয়ামের মুখদুটো ভালো করে কাপড় দিয়ে আটকিয়ে দু জ্ঞানীর হাতে তুলে দিল। তুলে দিয়ে বলল: এই দু বয়াম ভাষা দিলাম। খুব যত্ন করে নিয়ে যাবে। সাবধান! রাস্তায় কিন্তু খুলবে না। মুখ খুললেই কিন্তু ফার্সিভাষা পালিয়ে যাবে। এর গলায় গলায় খালি ভাষা আর ভাষা। বাড়ি গিয়ে শুক্রবারে অন্ধকার ঘরে রাতের বেলা দরজা-জানালা বন্ধ করে সবাইকে একত্র করে খুব আস্তে আস্তে বয়ামের মুখ খুলবে। বুঝলে? খুলে সবাই ইচ্ছামতন ভাগ করে নিয়ে নিবে। যে যার ভাগ পেয়ে খুব খুশি হবে।

বিশ রাজার ধন দিয়ে ওরা বহুকষ্ট করে ফার্সিভাষা নিয়ে তাদের গ্রামে এল। তারা এসেই সবাইকে সাধুবাদ জানাল। ফার্সি বোঝাই আশ্চর্য বয়াম দেখাল। তারপর ঠকের কথামতন দরজা-জানালা বন্ধ করে সবাইকে নিয়ে অন্ধকার ঘরে বয়াম খুলে দিল। যেই না খুলেছে আর অমনি সব ভীমরুল বের হয়ে যারে পায় তারেই কামড়ায় আর কামড়ায়। দরজা কোথায়, দরজা কোথায়? চিৎকার আর হাহাকার। দরজা খুলে গেল। একজন তার মাকে খুঁজছে, মা কই, মা কই? কে একজন বলে, তোমার মা ঐতো ঐদিকে গেল, একগাদা ফার্সি লেগে আছে তার গায়ে।

অবশেষে মাকে পাওয়া গেল। ভীমরুলের ভীমা কামড়ে বেচারিকে বিছানায় কাৎ করে দিয়েছে। ব্যথায় টাটায় আর টাটায়।

এরপর ঐ গ্রামের তাঁতিরা ফার্সিভাষা নিয়ে কোনো আর্জি করতে সাহস পায়নি। তাদের কথা হল : যারা চালাক চতুর তারাই নতুন ভাষা শিখুক গে। আমরা এসবের মধ্যে আর নেই।

*(পাঞ্জাবি রূপকথা)*

## সংগীতপ্রিয় দৈত্য

একদেশে ছিল এক খুব গরিব বামন। গরিবি হালৎ তার আর ভালো লাগে না। তাই একদিন সে করল কী, কাউকে কিছু না জানিয়ে গ্রাম ছেড়ে হাঁটতে থাকে। হাঁটতেই থাকে। রোদ বিষ্টি ঝড় ঝাপটা খুব কষ্টে অতিক্রম করে কয়েক দিন পর সে ছায়াসুনিবিড় এক বাগানের কাছে এসে একটু জিরুবে এ আশায় এক গাছের নিচে বসে গেল। একটু বসে বামন ইয়ে করতে যাবে, ঠিক তখনি এক গায়েবি আওয়াজ : কোরো না।

কিন্তু প্রাকৃতিক কাজ না করলে চলবে কী করে ? একটু থেমে বিয়োগ-কাজটা শেষ করে। পুকুরে হাত মুখ ধুতে গেল। যেই পানিতে হাত দিয়েছে অমনি বলে ওঠে : কোরো না। কিন্তু বামন তেড়িয়া, সে নিষেধ না মেনে কাজ শেষ করল। তো, সে মুড়ি বের করে খাবে, অমনি আওয়াজ আসে : খেয়ো না। কারো কথায় কান না দিয়ে সে খাওয়া শেষ করে। তারপর সে হাঁটা দিল, অমনি আওয়াজ আসে : যেয়ো না। একটু দাঁড়িয়ে বামন এদিক-ওদিক তাকায়। কাউকে না দেখে সে বলে ওঠে : তা তুমি কে হে? অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন হে?

—আরে একটু গাছের ফাঁকে দিয়ে উপরপানে তাকাও। তাকালেই আমাকে দেখতে পাবে।

তো, সে ভালো করে উপরপানে চেয়ে দেখে কী, এক ব্রহ্মদত্যি গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দত্যি বলতে থাকে : আরে যাবেই তো, যাবার আগে আমার দুটি কথা শুনে যাও না। তোমার মতো আমিও বামন। গত জনমে আমিও বামন ছিলাম। আমার করুণ কাহিনীটা একবার বলি।

তার কথায় বামন বলে, বেশ বলো।

ব্রহ্মদত্যি তার করুণ কাহিনী বলতে থাকে :

গত জনমে বামন থাকার সময় আমার গানের খুব নেশা ছিল, বুঝলে। শাস্ত্রীয় গানে ছিল আমার দারুণ দখল। গানের সব এলেম আমি চেপে গেলাম। কাউকে শুনাই না, কাউকে শেখাই না। আর সেই পাপেই আমি মরে ব্রহ্মদত্যি হয়ে গেলাম। এ হল ভগবানের শাস্তি। তুমি এপথে একটু গেলেই একটা ছোট মন্দির দেখতে পাবে। সেখানে এক বংশীবাদক সারা দিন বিশ্রী সুরে বাঁশি বাজায়, তোমাকে আর কী বলি। এ যে কী অন্যায় অত্যাচার! আমি একদম সইতে পারি না, একদম না। কানে আমার গরম সিসে ঢেলে দেয় বেটা উজবুক। একেকটা ভুল সুরে সে বাঁশি বাজায়। রাগে আমার শরীর ব্যথায় টনটন করে। ঐ ভয়ঙ্কর অসুর আমাকে শেষ করে দেবে। কিন্তু আমি তো খেপে গেলে সব ওলটপালট করে দেব। দত্যি হয়েছি, তাই আত্মহত্যা করতে পারি না। আমি এগাছে আটকা। কোথাও যেতে পারছি না। ভাই তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে পাশের জঙ্গলের এক গাছে রেখে যাও। যদি শেষজীবনে একটু শান্তি পাই। ওখানে গেলে আমার কিছুটা ক্ষমতাও ফিরে পাব। আমি তো তোমার মতোই বামন। মরে গিয়ে না ব্রহ্মদত্যি হয়েছি! আমার উপকার করলে তোমার খুব ভালো হবে।

বামনের মনটা ছিল খুবই নরম। নরম থাকলে কী হবে, অভাবী থাকতে থাকতে ঠকতে ঠকতে একটু চালাকও হয়েছে বৈকি। তো, সে একটু ভেবে-চিন্তে বলল: বেশ তোমাকে পাশের বনে নিয়ে যাব তা ঠিক। কিন্তু তাতে আমার লাভ কী? তোমার জন্যে কিছু করলে তুমি কি আমার জন্য কিছু করবে না? এমনি এমনি?

—আমার উপকার করলে তোমার জন্য অবশ্যই কিছু একটা করব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

বেশ তাই হোক। বামন তাকে মাথায় করে মন্দিরের কাছ হতে অনেক দূরে নিয়ে গেল। ব্রহ্মদত্যি কায়দামতো একটা গাছে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে পড়ল। দত্যি খুব খুশি। সে বুঝতে পারল জায়গা বদলের সাথে সাথে তার কিছু করার ক্ষমতাও ফিরে এসেছে। যাওয়ার সময় দত্যি বলতে থাকে: আমি জানি তুমি খুব অভাবি, বড় হতভাগা। তো, তুমি দুঃখ কোরো না। আমি যেমনটি বলি তেমনটি করো। তোমার দুঃখ-কষ্ট কিচ্ছু থাকবে না। তোমার কোনোদিন টাকার অভাব হবে না। এখন আমি মহীসুরের রাজকন্যার ঘাড়ে চেপে বসব। দুনিয়ার কবিরাজ গুলে, ডাক্তার গুলে খাওয়ালে আমাকে কন্যার ঘাড় হতে নামাতে পারবে না। কেবল, বুঝলে

কেবল তুমি গেলেই আমি সুড়ুৎ করে নেমে যাব। তাতে রাজা খুশি হয়ে তোমাকে অনেক বকশিশ দেবেন। যা পাবে তাতেই তুমি আরামে আয়েসে দিন কাটাতে পারবে। তবে হ্যাঁ, বেশি লোভ করবে না। আমি যদি অন্য কারো ঘাড়ে চাপি তুমি আবার নাক গলাতে যাবে না। গেলে কিন্তু তোমার ঘাড় আর ধড়ে থাকবে না সেটাও বলে দিলাম ।

তারপর বামন তার পথে চলতে থাকে। সে কাসি গেল। গঙ্গাস্নান করল। মন্দির দর্শন করল। তারপরে অনেক অনেক কষ্ট করে একসময় সে মহীসুরে গিয়ে পৌঁছল। বামন উঠেছে এক বিধবা বুড়ির ঘরে। টাকার বিনিময়ে তাকে থাকতে এবং খেতে দেয়। একদিন বামন বুড়িকে জিজ্ঞেস করে, তা বুড়িমা : রাজধানীর খবর কী? তখন বুড়ি বলতে থাকে : আমাদের রাজকন্যার ঘাড়ে এক দত্যি ভর করেছে। রাজা কত বৈদ্যি, ডাক্তার কোবরেজ, গুণিন দেখালেন কিন্তু সে দত্যি আর কেউ নামাতে পারে না। কোনো জাদুকরও পারছে না। রাজা ঘোষণা দিয়েছেন, যে এই দত্যি নামাতে পারবে রাজা তাকে, অনেক টাকা বকশিশ দিবেন।

বামন বুঝতে পারল এইতো তার সুসময়। সে রাজধানীতে গিয়ে হাজির। সে রাজাকে বলতে থাকে : আমি সত্যি সত্যি নামাতে পারবো।

বামনের রোগা পটকা চেহারা দেখে কারো বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বামন খুব জোর দিয়ে বলতে থাকে : আমি পারব। আমার এ বিদ্যা ঢের জানা আছে।

তো, রাজা সংশয় নিয়ে রাজি হলেন আর কী।

তাকে রাজকন্যার মহলে নেয়া হল। সে সেখান হতে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলল। তাকে দেখেই দত্যি বলতে থাকে : সেই কবে হতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তো আমি যাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখো আমি এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু লোভ করে যেও না। গেলেই তোমার সর্বনাশ। তুমি আর বাঁচবে না। এই বলে দত্যি রাজকন্যাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

কন্যা সুস্থ হয়ে গেল। রাজা খুশি হয়ে তাকে অনেক অনেক টাকা দিলেন। সাথে কয়েকটা গ্রামও দিলেন। বামন সুন্দর দেখে বিয়ে করল। তাদের ঘরে কয়েকটা সন্তানও হল। সুখে-শান্তিতে বামন জীবন কাটাচ্ছে।

সেই ব্রহ্মদত্যি কয়েক বছর পর এবার ত্রিবাংকুরের রাজার ঘাড়ে চেপে বসেছে। রাজা অনেক গুনিন, কোবরেজ, জাদুকর, ডাক্তার গুলে খাওয়াল,

কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রাজা খুব কাহিল হয়ে গেলেন। হঠাৎ কে যেন খবর দিল যে কয়েক বছর আগে মহীসুরের রাজার মেয়ের ঘাড়ে এক দত্যি ভর করেছিল। এক বামন সে দত্যিকে নামিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে সে তার রাজত্বেই বসবাস করছে। খবর নিয়ে রাজা এক করুণ চিঠিসহ এক দূত পাঠালেন। পত্র পেয়ে মহীসুরের রাজা বামনকে ডেকে পাঠালেন। রাজা তাকে আদেশ দিলেন ত্রিবাংকুর যেতে। কিন্তু বামন তো বুঝতে পেরেছে এটা দত্যি তাকে পরীক্ষা করছে।

তো এখন উপায়! একদিকে রাজাদেশ, অন্যদিকে জীবনমরণ সমস্যা! ওর সাথে আবার মোলাকাত! অনেকচিন্তা ভাবনা করে সে তার পরিবারের জন্য একটা সুব্যবস্থা করল। তাদের বলে দিল : যদি ফিরে না আসি চিন্তা করবে না। সব ব্যবস্থা করে গেলাম। তারপর বিদায় আদায় নিয়ে ত্রিবাংকুরের পথে রওনা দিল।

রাজদরবারে এসে সে কয়েকদিন এ অসুখ সে অসুখ বলে কয়েক মাস কাটাল। কিন্তু আর কাহাতক্, রাজা এবার তাকে খুব করে তাড়া দিলেন। তো, সে ভয়েই মারা যায় আর কী! কিন্তু মরার আগে তো আর মরা যায় না। কাজেই এবার মরিয়া হয়ে খুব সাহস নিয়ে রাজকন্যার মহলে হাজির হল। এসপার কি ওসপার। হয় মরণ নাহয় স্মরণ। সাহসের সাথে একটা বুদ্ধিও এসে গেল। সাহস নিয়ে রাজকন্যার ঘরে যেই না ঢুকেছে, অমনি চেঁচানি শুরু: ঐ লোভী বামন, তুই কেনরে? তোরে না করেছি না? আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। আয় কাছে আয় আগে। তোর ঘাড়টা মটকে রক্তটা খেয়ে একটু চাঙা হই।

তো, বামন ঘাবড়ে না গিয়ে বলতে থাকে : আরে আগে আমার কথাটা একটু শুনবে তো? তুমি আমার উপকার করেছ যেমন আমি তোমার উপকার করেছি-তাই না? সত্য কিনা?

—হাঁ সত্য। কিন্তু তোর তো লোভ হয়েছে।

—মোটেই আমার লোভ হয়নি। তোমার ভালোর জন্যই আমার আসা।

—কী? আমার ভালোর জন্য? কী ভালোরে?

—আরে শোনোই না। আমি তো এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, শুনলাম তুমি এখানে আছ। আসবার সময় দেখলাম ঐযে সেই বেসুরা গানের

দত্যিটা না তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে রাজবাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরাফেরা করছে। তুমি আমার উপকার করেছ। ভাবলাম আমিও তোমার একটা উপকার করে যাই। তাই তোমাকে খবরটা দিতে এলাম। কোথায় তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিবে, তা না করে আমাকে সাজ করার কথা বলছ। আরে কার সাজ কে করে! ঐতো গানের দত্যি আসছে।

—কি, ঐ বেসুরা গান আবার! রোখো, ওকে একটু রোখোরে বামন। আমি একটু কায়দামতো ভাগার জায়গাটা খুঁজে বের করি। এই কথা বলেই ভুস করে এক শব্দ করে দত্যি রাজকন্যাকে ছেড়ে চলে গেল। কন্যা ভালো হয়ে গেল।

রাজা খুশি হয়ে বামনকে অনেক বকশিশ দিল। কত গাড়ি টাকা দিয়েছিল? বামন তার বউ পোলাপান নিয়ে নাকি সে টাকা এখনো গুনছে।

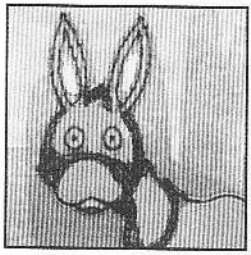

## গন্ধর্বসেন মারা গেছেন

এক বাদশা দরবারে কেবল বসেছেন। এরমাঝে এক মন্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করা শুরু করে দিল। বাদশা বিরক্ত হয়ে বললেন: আহা! এত কান্নার কী হল?

মন্ত্রী বাদশার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বলল, হুজুর সর্বনাশ হয়ে গেছে। গন্ধর্বসেন মারা গেছেন।

সাথে সাথে দরবার বন্ধ হয়ে গেল। বাদশাহি হুকুম জারি হল: আজ হতে পাক্কা ৪১ দিন দেশের সব প্রজারা শোক পালন করবে। মৃতের আত্মাকে শ্রদ্ধা জানানো আমাদের জরুরি প্রয়োজন।

দরবার ভঙ্গ করে বাদশাহ যখন অন্দরমহলে গেলেন তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে গেলেন। তার কান্না দেখে অন্দরমহল কেঁদেকেটে অস্থির। কিছুক্ষণ কাঁদার পর বেগমরা বাদশাকে প্রশ্ন করল: হলটা কী? তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন : আরে জানো না, গন্ধর্বসেন মারা গেছেন!

আর যায় কোথায়, বলার সাথে সাথে বেগমসহ অন্দরে যত দাসদাসী ছিল সবাই গলা জড়াজড়ি করে বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে লাগল। ভিতরবাড়িতে সে কী শোক! তা কহতব্য নয়।

বড় সাহেবার এক দাসী তো এমন কাণ্ডকারখানার আসল কারণটা বুঝতেই পারেনি। সে আগ্রহসহকারে সাহেবাকে প্রশ্ন করে: হাঁগো, সবাই এমন উড়াধুড়া কানছে কেনে?

বড়সাহেবা ইয়াবড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: শুনিসনি, বেচারা গন্ধর্বসেন মারা গেছেন।

—তা তিনি আপনার কী হয়?

—তাতো জানি না বাছা! বড় বেগম খুব বেগে ছুটে গেলেন বাদশার কাছে। তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন, যার জন্য সবাই মুখে মাতম করছে সেই গন্ধর্বসেন লোকটা কে?

সে তো বাদশারও জানা নেই। বোকা হয়ে তবদা মেরে বসে রইলেন, তারপর ছুটে গেলেন দরবারে। দরবারে গিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করে : কি হে মন্ত্রী, যার জন্য আমরা শোকে কাতর সেই গন্ধর্বসেন লোকটা কে?

এবার মন্ত্রী জড়সড় হয়ে বলতে থাকে তো : তা জানি না হুজুর। তবে কী! দেখলাম যে কোতোওয়ালীর বড় দারোগা কাঁদছে আর বলছে, গন্ধর্বসেন মরে গেল! মরে গেল। সে চাইছিল সবাই তার সাথে কাঁদুক। জাঁহাপনা আর আমিও তাই!

বাদশাহ গর্জে উঠে বললেন : তুমি একটা তাজা উজবুক। যাও এখনি যাও খোঁজ করে জেনে আসো গন্ধর্বসেন লোকটা কে!

মন্ত্রী কুর্নিশ করে পড়িমরি করে ছুটে গেল। সে বড় দারোগার কাছে গিয়ে জানতে চাইল ঐ গন্ধর্বসেন কে।

দারোগা কতক্ষণ তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল : পরলোকগত গন্ধর্বসেন যে কে সেটা সেও ভালো করে জানে না। তবে জমাদার কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। সে বলেছিল, গন্ধর্বসেন মারা গেছে। তখন জমাদারের সাথে সেও একটু কেঁদেছিল। আপনাকে আমি তো সেটাই বলেছিলাম।

মন্ত্রী আর দারোগা মিলে জমাদারকে খুঁজে বের করল। তাকে কাঁদার কারণ বয়ান করতে বলল। তখন সে অবাক হয়ে বলল : সেটার আমি কী জানি। দেখলাম আমার বউ কাঁদছে আর বলছে আমার গন্ধর্বসেন মারা গেল, মারা গেল, বলছে আর কাঁদছে। তার কান্না দেখে আমার কান্না এল তাই একটুখানি কাঁদছিলাম আর কী! আমার দুঃখ নিয়ে আপনাকে কথাটা বলেছি মাত্র। হুজুর ভুল বুঝবেন না। কেউ কাঁদলে আমার বড় কান্না পায়। বউ কাঁদল, তার সাথে আমিও কাঁদলাম।

ওরা গেল জমাদারের বউয়ের কাছে। তার কাছে জানতে চাইল সে কেন কাঁদছিল। সে বলল : তার কী আমি জানি। পরলোকগত সম্বন্ধে সে কিচ্ছু জানে না। সে গিয়ে ছিল পুকুরপাড়ে স্নান করতে। সেখানে গিয়ে দেখে ধোপানী আছড়ে পিছড়ে কাঁদছে আর বলছে, ওর গন্ধর্বসেন মরে গেল।

ওরা ছুটে গেল ধোপানীর বাড়িতে। তাকে বিষয়টা খোলাসা করার জন্য বলা হল। কাঁদার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলল।

ধোপানী সব শুনে আরো হাহাকার করে কেঁদে উঠল। কাঁদে আর বলে: আমি বড় অভাগীগো। আমার গন্ধর্ব মারা গেল। সে ছিল আমার আদরের গাধা। আমার আদরের সন্তান গন্ধর্বসেন আমাকে একলা রেখে মারা গেল গো! তারে যে আমি ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম।

তার মুখের বাক্যি আর ফুরায় না। একবার থামে আবার কেঁদে আকুল হয়ে আতারিপাতারি করে। ওরা বড় অপদস্ত হয়ে ফিরে গেল।

মন্ত্রী দরবারে এসে বাদশার পায়ে পড়ে সত্য ঘটনা সব বলে দিল। বাদশাহ রাগারাগি করে সবাইকে মাফ করে দিল। কিন্তু খবরটা যখন অন্দরমহলে গেল তখন বাদশাহ আর তার সভাসদের কারবার নিয়ে হেসে সবাই কুটিকুটি। হাসতে তাদের পেটে খিল লেগে যায় আর কী। অনেকে হাসতে হাসতে বিছানার বদলে মাটিতেই শুয়ে পড়ল।

## বলবে, র'য়ে স'য়ে বলবে

এক দেশে ছিল এক জমিদার। অনেক ছিল জমি তার। ছিল না তার কোনো অভাব। তবে একটুতেই রেগে যাওয়া তার স্বভাব। সে ছিল চাপায় খুব সবল, তবে কলিজায় খুব দুর্বল। বাড়ির সবার উপর হুকুম ছিল: ওকে যে যাই বলছ বলার আগে সাবধান। যা বলবে এবং যে বিষয়ে বলবে আগে হতে সাবধান। কেমন করে কী বলবে? যাই বলো না কেন, খুব খেয়ালে আর র'য়ে স'য়ে বলবে।

একবার তিনি তার লটবহর নিয়ে হরিণ-শিকারে বনে গেছেন। কয়েকদিন পর হঠাৎ এক চাকর এসে হাজির। জমিদার তো অবাক। সে জানতে চায়: কী ব্যাপার, তোমার তো আসার কথা নয় ! তা বাড়ির সব ভালো তো?

— জি হুজুর সব ভালো, তবে সাদা-কালো কুকুরটা হুজুর মরে গেছে।

— আরে বলো কী! আসার সময় তো ভালো দেখলাম। তা কী হয়েছিল?

— বদহজম হয়ে গেল হুজুর। অত ঘোড়ার মাংস খেলে কীভাবে বাঁচে বলুন?

— ঘোড়ার মাংস? তা বেশ, পেল কোথায়?

— আমাদের আস্তাবলেই। তাছাড়া আর কোথায় পাবে?

— আরে বলছ কী! তবে কি ঘোড়া সব মরে গেছে?

— ওদের যখন খাবার দেবার মতো কেউ নেই, তখন বাঁচে কীভাবে?

— কেন সহিসদের কী হল?

— যখন মাইনে দেবার কেউ থাকে না, আর উপোস দিয়ে থাকতে হয়, তখন মানুষের যা হবার তাই হয়েছে।

— কী বলছ তুমি অ্যাঁ? কেন, কেন, মাইনে পায়নি ওরা? আমার নায়েব গোমস্তা, তারপর আমার গিন্নি?

— রান্নার লোক যখন থাকে না, খেতে দেবারও কেউ থাকে না, তখন তারা বাঁচে কীভাবে? আপনিই বলুন হুজুর।

— কেন রাঁধুনীর কী হয়েছিল?

— সে আর বাঁচে কীভাবে? যখন রান্নাঘরই পুড়ে গেল, আর আগুন সারা বাড়িতে ছড়িয়ে সব পুড়িয়ে দিল, মরেই গেল সব্বাই, তখন রাঁধুনী বাঁচে কী করে হুজুর। আপনি বলুন হুজুর!

*(উর্দু রূপকথা অবলম্বনে)*

## একটি সাদামাটা গল্প

দা– হা, হা বাবু বলো, দা–দা। খুব কষ্টে 'দাদা' শব্দটি ছোটবাবু অবশেষে উচ্চারণ করল। বাসায় উপস্থিত সবাই তালি দিয়ে উৎসাহিত করল।

বাবুর বয়স মাত্র এক বছরে পড়েছে। তার প্রথম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বাবুর দাদু, নানু কেউ আসেনি। তারা গ্রামে থাকে। তবে ঢাকায় যেসব আত্মীয়রা থাকে তারা সবাই এসেছে। আচ্ছা বলছি কারা কারা ছিল। এই ধরো, বড় খালা , খালু , আর খালার তিন সন্তান। ছোট খালা, খালু সহ তার দুই ছেলেমেয়ে। চাচাদের মাঝে চাচা চাচি আর তাদের এক পিচ্চি। বাবুর বাবার বন্ধু-বান্ধব। পাড়া-প্রতিবেশী। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন তো হবেই।

তো, বাবুর প্রথম শব্দ 'দাদা'। সবাই মহাখুশি। বিশেষ করে তার বাবা আর মা। মাত্র এক বছরের শিশু সে 'দাদা' বলেছে–বিষয়টা গর্ব করে প্রকাশের ব্যাপারই বটে। ধুমছে খানাদানা করে পিটিয়ে রাত ১১টা পর্যন্ত আড্ডা চলল। তারপর যে যার মতো চলে গেল।

পরের দিন বিকেলে খবর এল বাবুর আসল দাদা মারা গিয়েছে। হাঁ, যেতেই পারে। কারণ তার বয়স চলছিল প্রায় আশি। বিছানায় পড়ে পড়ে ভাব। বাবু হয়তো বুঝতে পেরেছিল তার আপন দাদা মারা যাবে। তাই সে জীবনের প্রথম এবং শেষ ডাকটা দিয়ে দিল। যাক কয়েকদিন। বেশ দৌড়াদৌড়ি, নানান ঝকমারিতে সবাই ব্যস্ততার মাঝে দিনপাত করল।

এক এক করে আবার বছর ঘুরে বাবুর দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী চলে এল। যথারীতি আয়োজন, নিমন্ত্রণ সব সম্পন্ন হল। এবার বাবু 'নানা' শব্দটি বেশ অবলীলায় উচ্চারণ করল। বাবা-মা একটু চমকে উঠেছিল। কিন্তু আর কিছু না। অনুষ্ঠান বেশ ভালোভাবেই শেষ হয়ে গেল।

ঠিক পরের দিন খবর এল বাবুর মায়ের বাবা মানে তার নানা মারা গেছেন। বাবা-মায়ের মন চমকে ওঠে। আরে বাবু যার নাম জন্ম-তারিখের অনুষ্ঠানে প্রথম উচ্চারণ করে সেই তো মারা যাচ্ছে! তাদের মন বলে : হাঁ, যেতেই পারে, বাবুর নানার বয়সও তো প্রায় ৭০ হল। তা মারা যাবার মতো বয়স বটে। কিন্তু তার তো তেমন কঠিন কোনো অসুখ ছিল না। এ আবার কী জ্বালারে বাবা! এমনিতে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। বাবুর এমন উচ্চারণ-বিষয়ক আগাম-বাণীতে সবাই ভাবিত হয়ে পড়ল।

বাবুর মা-বাবা সিদ্ধান্ত নেয় : না, আর তার জন্মবার্ষিকী পালনের দরকার নেই। নমুনা খুব ভালো নয়। কিন্তু জন্মদিন যত আগায় ততই বাবা-মা ম্রিয়মাণ হয়ে অজানা আশঙ্কায় দুলতে থাকে।

শেষপর্যন্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে তৃতীয় জন্মবার্ষিকীর আয়োজন করতেই হল। কিন্তু সবাই স্বাভাবিক থাকলেও তার মা-বাবার মনে এক অশুভ আতঙ্ক সবসময় কিলবিল করতেই থাকে। এবার কার নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ মালুম। এবার দেখা গেল বুড়ো কারো নাম উচ্চারণ করেনি। এবার সে তার মামার নাম, মানে বাবু 'মামা' শব্দটি উচ্চারণ করেছে।

বাবুর মামা ছিল আরবে। পরদিন খবর এল তার মামা রোড-অ্যাকসিডেন্টে সৌদিআরবে মারা গেছে।

হায় কী সর্বনাশ! এ দুই বছর ময়-মুরুব্বিদের উপর দিয়ে গিয়েছে। এবার তো দেখি তরতাজা কমবয়সীদের নাম বলছে আর একদিন পর মারা যাচ্ছে।

যাক সিদ্ধান্ত হল, ও যতদিন বেঁচে থাকবে আর জন্মদিন পালনের দরকার নেই। ব্যাস সিদ্ধান্ত প আকারে পা, ক আকারে কা, মানে পাকা–পাক্কা।

তো, এভাবের সিদ্ধান্ত নিয়েই সবাই একবছর কাটাল। কিন্তু যতই বাবুর জন্মদিন আসে, বাবুর ঘনিষ্ঠরা অনিষ্ট দেখতে এক অজানা আকর্ষণে দোলায়িত হতে থাকে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করে : আরে, এসব হচ্ছে গিয়ে কুসংস্কার। কাকতালীয় ব্যাপার-স্যাপার। যার মরণ যেভাবে হবার সেইভাবেই হচ্ছে। মাঝখান হতে বেচারা বাবুর অবস্থা কাবু আর কী! তাই বলে ও দায়ী হতে যাবে কেন?

বাবুর এক নেতা কাকু আছে সে এবার নিজে দায়িত্ব নিয়ে জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজনের যাবতীয় উদ্যোগ নিল। এবারের আয়োজন

মাশআল্লাহ দেখার মতো আর খাওয়ার মতো বটে। চমৎকার আয়োজনে এবার লোকজন কম হল। ঐযে ভয়ে! তবে একটা আশঙ্কা ঐদিন কম থাকে, কারণ যেদিন অনুষ্ঠান সেদিন কেউ মারা যায় না। কিন্তু যাকে সে সর্বনামে ডাকবে তার তো ঘুম হয় না। এবার দেখা যাক কী হয়? অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতো আর কী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ঐ নেতা কাকুর। সেদিন সে তাকেই মরণ-ডাক দিয়ে বসল এবং যথারীতি পরদিন সকাল দশটার মধ্যে ঐ কাকু পগারপার। অকালমৃত্যুতে সবাই শোকাহত। বাবু নিজেও কান্নায় কান্নায় ম্রিয়মাণ হয়ে গেল : আহারে, আমার নেতা কাকু । তোমার সাহস ছিল কত! এখন আমাকে কে সাহস দিবে? এসব বলে আর বাবু কান্না করে।

তো যাই হোক, বাবুর জন্মদিন পালন ঐবছরেই বন্ধ হয়ে গেল। তিন বছর। এর মধ্যে কেউ আর বাবুর জন্মদিনের কথা মনে এলেও মুখে উচ্চারণ করেনি। ভাবটা এমন যে যার নাম উচ্চারণ করবে সেই মারা যাবে। মা-বাবা গবেষণা করছে কার নাম বলিয়ে কাকে মারা যায়। জোর করে বলানো হলে ফলবে কিনা! নাকি আপছে আপ যার নাম বলবে সেই কতল হবে! তিন বছর নিকট-আত্মীয়স্বজন যখন কেউ মারা গেল না তখন তাদের বদ্ধমূল ধারণা হল যে ও নিজে যার নাম বলবে সেই মারা যাবে। আর তাদের বাইরে কারো নাম বললে তার ফল কী হবে সেটা প্রমাণ করার মতো সাহস নিয়ে কেউ আর দায়িত্ব নিচ্ছে না।

ঠিক তিন বছর পর। আবার একটা রিস্ক নেবার চিন্তাভাবনা পরিবারের সবার মাঝে চলতে তাকে। বাবু যদি এলাকার 'গচই' মস্তানের নামটা বলে তা হলে তো কেল্লা ফতে। বলতেও পারে, কারণ বাবুর এখন ছয় বছর চলছে। তাছাড়া গচই মস্তানের উপর সে নিজেও একটু চটা আছে। তার কারণ ঐ বেটা নাকি ওদের কয়েক বন্ধুকে ভয় দেখিয়েছে। ওরা সমাজের ভালো-মন্দ নিয়ে একদিন কথা বলতেছিল। তখন ওর এক চেলা তাকে গিয়ে রিপোর্ট করেছে। সে রিপোর্ট পেয়ে গচই নাকি খুব মাইন্ড করেছে। কারণ এ সমাজের ভালো-মন্দ যাই হোক, সব করবে গচই এবং তা সাঙ্গোপাঙ্গরা। পিচ্চি পোলাপানে আবার কী করতে চায়! আর করবে তো তার পারমিশন ছাড়া এলাকায় কেউ কিছু করেছে কি মরেছে।

তো, বাবুর বন্ধুরা বর্তমানে গচইর চিপায় পড়ে মরে মরে অবস্থা। এলাকার সবার আবেদন : এবার বাবুর জন্মবার্ষিকী আমরা সবাই পালন করব। যদি ওকে দিয়ে ঐ মাস্তানের নামটা বলানো যায় তো কেল্লা ফতে।

শেষপর্যন্ত আয়োজন হল। বাবুর বন্ধুরা বলেছে, বাবু তুই এবার গচইর নাম বলবি।

তো সবাই, সেই মহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়। কেক কাটা হল। খাওয়া হল। নাচা গানা সব হল। শেষের নাটকের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। ইতোমধ্যে গচইর চেলারা তাকে সব জানিয়ে দিয়েছে। বাবু তার জন্মদিনে যার নাম ধরে ডাকবে সেই নাকি পরদিন মারা যায়।

তো, মরণকে কে না ডরায়। খুব সাহসী বীরযোদ্ধাও মরণরে ভয় পায়। গচইও ভয় পেয়ে গেল। সব খবর নিয়ে সে জানতে পারে আসলেই ঘটনা সত্য। বাবুর বন্ধুরা তার নাম বলার জন্য তদবির করছে। এখনও বলেনি, কিন্তু বলতে কতক্ষণ! একজন বুদ্ধি দেয় : ওস্তাদ চলেন, ও নাম বলার আগেই ওকে শেষ করে দেই।

এ্যাঁ! বুদ্ধিটা তো মন্দ নয়। কিন্তু ওর কী অপরাধ। ও ছেলে তো তার কোনো ক্ষতি করেনি। ওকে আমি মারব কোন্ কারণে? যা যা বেটা, এইসব ফালতু চিন্তাভাবনা বাদ দে। তার চেয়ে দেখি না কী ঘটাতে পারে। আরে দেখি না, দুপুর উপুড় করে নূপুর বাজানো বন্ধ করতে পারে কিনা! আরে দেখি না, বাবু আমাকে কাবু করে নাকি, নিজেই কাবু হয়ে কাবুল চলে গিয়ে হাবলুর সাথে কামলু খাটা শুরু করে! আরে জানিস তো মারা যায় বালু, নেতা হয় ফালু, হেরে যায় মালু, আমি কার খালু? আর আমি আজ রাতেই : এদেশ ছেড়ে চলে যাব। আমাকে পায় কে? ৪৯ মামলার আসামি হয়ে আর কত চাঁদা খাওয়াব? শালার পুলিশ যা চিজ! আইতেও কাট যাইতেও কাট।

কিন্তু সময় সবসময় নিজের দখলে রাখা যায় না। গচই বিদেশে যেতে পারল না। যথারীতি বেলা ডুবে গেল। রাত এল। পেঁচা ডাকল। সকালে মোরগ ডাকল। ভোর হল। বেলা উপরে এসে হেসে দিল। ঠিক বেলা দশটায় ঘটনাটা ঘটেই গেল। আচমকা হার্ট অ্যাটাকে গচই মচই হয়ে শুয়ে গেল। গোরস্তানে মস্তান চিরতরে প্রস্থান করল।

মস্তানের চেলাচামুণ্ডারা ভয় পেয়ে গেল। তবে বাবুর বন্ধুরা আর তার পাড়াপ্রতিবেশীরা খুব খুশি। পুলিশের গোয়েন্দারা তার পিছনে লেগে গেল। তাকে বলা হল : আমাদের সাহায্য করো। দৈনিক তোমার জন্মদিন পালন করা হবে। যাবতীয় খরচ আমরা তোমাদের দেব।

কিন্তু প্রস্তাব কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। তবে বাবুর জন্মদিন পালন আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে কতদিন গেল তা গুনে রাখা হয়নি। তবে অনেক বছর গেল আর কী।

বাবুর যখন গোঁফ গজাল তখন সে উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করার চিন্তা করা হল। সামনেই জন্মদিন। এখন কীভাবে কী করবে? সবার চিন্তা ওকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী করা যায়, কী করা যায়! এসব ভাবতে ভাবতে দিন চলে যায়। রাতও চলে যায়। এলাকার মাস্তানরা খুব পেরেশানিতে আছে। খারাপ লোকরা খুব চিন্তায় আছে। যারা মানুষের ভালো চায় না, তারাও খুব চিন্তায় করুণভাবে কাহিল। ওরা বাবুকে কাবু করার ফন্দিফিকির করতে থাকে। কিন্তু বিষয়টা খুব সোজা নয়।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

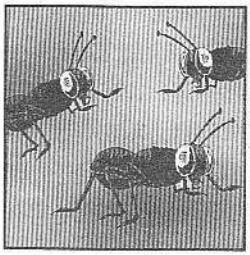

## পিপীলিকার পাখা গজায় মারিবার তরে

দেশের যখন আউলাঝাউলা অবস্থা, আন্ধাগুন্ধা মাইর পিট, আলো আন্ধাইর বুঝা মুশকিল, ঠিক তখনকার ঘটনা। পাকবাহিনী আর রাজাকারদের ঠ্যাক দিয়া লড়াকু বাঙালি যখন জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত, ঠিক তখনকার ঘটনা। ঘটনা তোমাদের বিশ্বাস নাও হতে পারে। আবার হতেও পারে। না হবার কারণ যুক্তি দিয়ে বিচার-বিবেচনা। বিশ্বাস হবার কারণ এটা রূপকথা। রূপকথায় সব সম্ভব, তাই না! যার হবে না তার জন্য তিন টন হতাশা।

তো, ঐ সময়ের ঘটনা। যুদ্ধের সময়ের কথা। এক গ্রামে কয়েকটা পাকসেনা আর কয়েকটা রাজাকার গিয়ে করল কী! প্রথমে লুটপাট আর ফুটফাট করে আগুন দিয়ে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে চলে গেল। অনেক কিছুর সাথে অনেকগুলো পিঁপড়াও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মাত্র একটা বয়সী পিপীলিকা কোনোমতে আহত হয়ে বেঁচে গেল।

তো, কয়েকদিন পর একটু সুস্থ হয়ে সে তার সঙ্গীদের খুঁজল। মাত্র ১৩ জনকে পাওয়া গেল। তারা জরুরি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিল, ঐ বেটাদের জব্দ করতে হবে। আমরা প্রমাণ করব : পিপীলিকার পাখা গজায় মারিবার তরে।

পি পি করে গ্রামের, পাশের গ্রামের, রাস্তার, মাঠের, গাছের পিঁপড়াদের একত্র করে গেরিলা-আক্রমণ কেমনভাবে করবে তার একটা লালনকশা করা হল। আরো দশদিনে হাজার হাজার লাখো লাখো পিঁপড়াকে খবর দেয়া হল। তাদের হুলে ১০ দিন ধার দেয়া হল। তারপর চারদিকে চার বাহিনীকে মোতায়েন করা হল।

চারজনকে রেকি করার জন্য পাঠানো হল। তারা তিনদিনে তিন মাইল গিয়ে রাজাকার আর পাকবাহিনীর ক্যাম্পের অবস্থান জেনে তারপর চারদিক দিয়ে ঐ ক্যাম্পে প্রবেশ করে গেল।

রাত ১২ টা। চতুর্দিক থেকে পিলপিল করে পিপীলিকা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ঢুকে গেল সরাসরি মেজরের কক্ষে। ১লাখ ৯৯ হাজার পিঁপড়াবাহিনী একসাথে মেজরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে নাকে তারপরে চোখে তারপর পিছন দিয়ে চেল্লৎ করে কয়েকটা ঢুকে কামান দাগিয়ে মেজরকে মাইনর করে দিল। যেখানে হাত সেখানেই দলা দলা পিঁপড়া। কয়টা মারবে? পিঁপড়ার দঙ্গল দেখে মেজর সাব তো তবদা মেরে বেসামাল। তাকে আর ভাবার সময় দেয়া হল না। দশটা মারে তো বিশটা কামড়ে পাগল করে দেয়। এর মধ্যে তিনটা বিচ্ছু পিঁপড়া নাক দিয়ে ঢুকে কুটকুট করে কামড়ানো শুরু করেছে।

রাত গভীরে সেন্ট্রি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে এবং সবাই আক্রান্ত। সেন্ট্রিদেরও আক্রমণ করা হয়েছে। পিঁপড়ার দল ক্যাম্পের সবাইকে একযোগে গেরিলা হামলা করেছে। মেজর তো বলে ওঠে : এ কেয়া হুয়া। 'ওরে বাবা' করে পিস্তল দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। গুলি গিয়ে লেগেছে এক সেন্ট্রির বুকে। আর যায় কোথায়। মুক্তি, এইসব রেড়ি হ্যায়, মুক্তি আক্রমণ কর্ দিয়া।

বিপদ-সঙ্কেত বাজানো হল। পিঁপড়ার কামড়ে সবাই পাগল। উল্টাপাল্টা গোলাগুলি করে আধঘণ্টায় ৩০ জন খতম। মাত্র ১০জন নেংটা হয়ে দৌড়ে দৌড়ে জীবন রক্ষা করল।

কিন্তু ওখানেও পিঁপড়ার দল মজুত ছিল। খালিগায়ে আরো মজা। খুবছে কামড়। ওরে বাবা। মুক্তিরে, বাঁচাওরে, গেলামরে।

এর মাঝে আশেপাশের মুক্তিরা ঘটনা বুঝতে পেরে ওদেরকে ধরে নিয়ে আচ্ছামতো কাবাব বানিয়ে টানিয়ে রেখে দিল। তারপর পিঁপড়াগুলোকে মহাভোজ করার জন্য আহবান করা হল। কিন্তু পিঁপড়ার রাজা ঘোষণা দিল : কোনো রাজাকার পাকবাহিনীর রক্ত আমরা খাব না। ওদের রক্তে আমাদের দেহ বৃদ্ধি করাব না।

আর পিঁপড়ার কামড়ে রাত তিনটার সময় পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য হাহাকার করতে করতে মেজর ভবলীলা সাঙ্গ করল। মরার আগে শুধু শুনতে পেল : পিপীলিকার পাখা হয় মারিবার তরে।

## একাত্তরে একজন দাদির গল্প

সেই আচানক সময়ের কথা। সেই বিস্ময়কর'৭১-এর সময়কার ঘটনা। আজো জ্যান্ত হয়ে হাসি-কান্নার মাঝখানের অনুভূতি মনের মাঝে আছাড় খায়।

আমাদের গ্রামটা ছিল না-শহর না-গ্রাম। শহর হতে উত্তরে বের হলে এক কিলোমিটার হাঁটলেই গ্রাম। গ্রামের সামনে রাস্তা এসে থেমে গেছে। একটা খাল শহর আর গ্রামের ভালোবাসার সংযোগ দু'ফাঁক করে দিয়েছে। রাস্তা শেষে একটা বটগাছ খালের পাড়ে দাঁড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যুদ্ধের বছর হঠাৎ করেই গ্রামটির গুরুত্ব বেড়ে গেল। এই গ্রাম হতে ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধে গিয়েছিল। আর ৫ জন রাজাকারে ভর্তি হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে সুযোগমতো মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সুজনপুরে বিভিন্ন বাড়িতে অতিথি হয়ে রাজাকারদের খোঁজখবর, শহরের কী অবস্থা তা জেনে ভোর হবার আগেই নিরাপদে সরে যেত। অন্যদিকে ফকফকা দিনের বেলা রাজাকাররা আসে মুক্তিবাহিনীর খোঁজখবর নিতে। যেসব বাড়ির ছেলেরা মুক্তি হয়েছে সেসব বাড়িতে হুমকিধামকি দেয়। লাউটা, মুলাটা, কলাটা নিয়ে যায়। আর আল্টিমেটাম দেয়। আগামী সপ্তাহে ছেলেকে রাজাকারদের হাতে 'সাইলেন্ডার' না করালে বাড়ি ঘরসব পুড়িয়ে দিবে। মা-বাবাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। মুক্তিযোদ্ধার মা-বাবারা কাকুতিমিনতি করে সময় প্রার্থনা করে। অনেকে ঘর-বাড়ি খালি করে দূরের কোনো গাঁয়ের আত্মীয়বাড়িতে অবস্থান নিয়েছে। পুরুষমানুষ বলতে গেলে দিনের বেলায় বাড়িতে কেউ থাকেই না। যারা থাকে তারা অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা।

সুজনপুরে বড়বাড়িতে একজন দাদি ছিলেন। সে গ্রামের কমন দাদি। মুক্তিবাহিনীর সদস্য দোয়া নেয়। মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেয়। শুভ কামনা করে। এভাবেই চলছিল। কিন্তু একদিন ঘটনা প্যাঁচ খেয়ে গেল। বুড়ি তো আফসোস করে বাঁচেই না। পারলে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় আর কী।

একদিন ঠা ঠা রোদ। তার আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাড়িতে এ্যান্ডিগেন্ডিরা আর এক বুড়া বুড়ি। বুড়ি মানে দাদি। কয়েকজন রাজাকার খালপাড়ে এসে দাঁড়াল। তাদের দেখে গ্রামের সব লোক পিছনের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকল। জোয়ানরা গ্রাম ছেড়ে চলেই গেল। রাজাকাররা খাল পার হয়ে গ্রামে ফুটুস করে ঢুকে গেল। সব বাড়ি ফাঁকা। নিস্তব্ধ। শেষে বড়বাড়ি এসে 'দাদি দাদি' করে একজন ডাকতে থাকে।

দাদি চোখে কম দেখত, কানেও একটু খাটো ছিল। কী কাজে যেন ব্যস্ত ছিল। রাজাকারদের দেখে বাড়ির বুড়ারাসহ সব পালিয়েছে। কিন্তু তাকে কেউ ডাকও দেয়নি, টানও দেয়নি। ফলে যা হবার তাই হল। গ্রামের দক্ষিণপাড়ার হারু মিয়ার পোলা বারু মিয়া রাজাকার। সে 'দাদি দাদি' করে তাকে ডাকতে থাকে। মুক্তি আর রাজাকারের একই চেহারা, কাপড়চোপড় আর রকমসকম দেখে বুড়ি ভাবল মুক্তি এসেছে। কাজেই সে খুব খুশি হয়ে জবাব দেয়: কি, কী কস্‌রে? এইদিকে আয়।

বারু বলতে থাকে: দাদি আমাদের একটু দোয়া করে দাও।

—কাছে আয়। চোখ্যে তো কম দেহি।

কাছে এসে বারু রাজাকার সালাম করে। সে দোয়া করে : তোদের আল্লাহ ভালো করুক। জয় তোদের হবেই।

বারু সালাম করে বলে: দাদি একটা কুড়াল দাও তো।

দাদি কুড়াল এনে তার হাতে দেয়। বারু কুড়াল নিয়ে পাশের বাড়ির তালা ভেঙে আবার ফিরিয়ে দিয়ে লুটপাট করে চলে যায়।

খাল পার হলেই পলাতকরা সব বাড়িতে এল। জঙ্গল হতে অনেকে ঘটনা দেখেছিল। তারা তাড়াতাড়ি এসে দাদিকে বলে: তুমি করলা কী? রাজাকারদের দোয়া করলা। আর কুড়াল দিলা? ওরা তো পুবের বাড়ির তালা ভেঙে সব লুটপাট করে নিয়ে গেল।

বুড়িতো হায় হায় করে বিলাপ শুরু করে দিল। বলছে : আমি করলাম কী? ওদের দোয়া করলাম! আবার কুড়ালও দিলাম!

লজ্জা শরমে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সবাই তাকে আটকাল। অনেকে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে থাকে । দাদি বলে : ঐ ঢেহররা হাসস ক্যা? মুক্তি আর রাজাকার চিনন যায়নি? সবাইরে তো একরকম মনে হয়। অস্ত্রপাতি, চলাফেরা, কথা-বার্তা, ডাক-টাক সব তো একরহম লাগে। আমি কী করমুরে?

একজন বলল: বারু রাজাকার কিন্তু ভালা রাজাকার, কুড়ালডা কিন্তু তোমারে ফিরাইয়া দিছে।

কিন্তু দাদি না হেসে বলে: তোরা অহন এ কুড়াল দিয়া আমার মাথায় একটা কোপ দে। তালি আমার জান্‌ডায় শান্তি পাইব।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

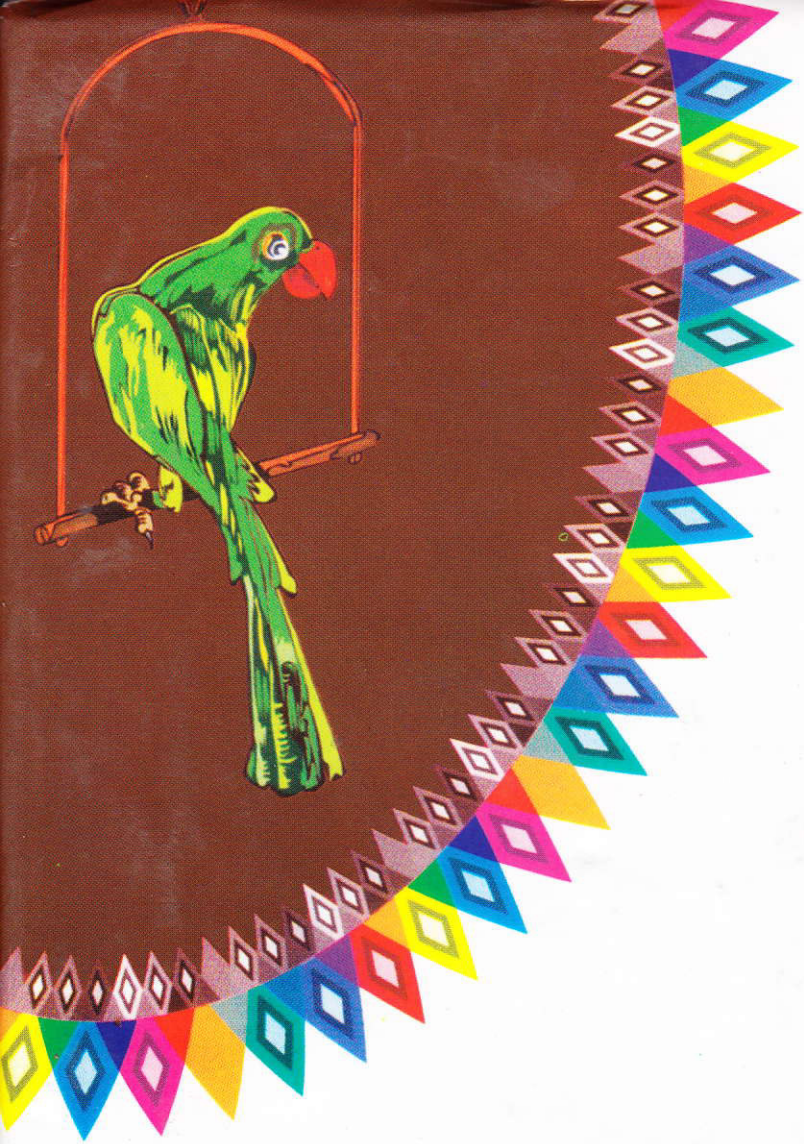

গুণগত শিক্ষা উন্নত জীবন
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়